‘কবিতা’ পত্রিকা এবং তার অকুণ্ঠ সম্পাদক

সুমন গুণ

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে লেখালেখি নিয়ে আলোচনায় মানে ও পরিমাণে, বহরে ও বৈচিত্র্যে যাঁরা বহুতল অবদান, তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরই তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি কথা উদ্ধার করছি ঃ

ক. ‘‘কবিতায় তুমি যে গদ্য আলোচনা করো ভাষায়, ভাবে ও অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে। সাধারণত বাংলা কাগজে সমালোচনা অত্যন্ত ফিকে হয় — তোমার লেখার মধ্যে বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়, অনেকটাই ফাঁকি বলে মনে হয় না।

খ. ‘‘তুমি মাস্টারি করছ তবু তোমার লেখায় পন্ডিতি ঢুকে তাকে ক্লাস পড়ানোর তলায় কাৎ করে ফেলেনি।’’

গ. ‘‘সাহিত্যে বিচার কার্যে আমি দেখেছি তোমার লেখনীর দৃঢ়তা। তার পরিমাণ - বোধের উপর নির্ভর করা যায়।।’’

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য - সমালোচনা প্রসঙ্গে অবধারিত সব কথাই এই শিরোধার্য উচ্চারণস্তবকে আছে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষা ছিল অনিবারণীয়ভাবে তাঁর নিজস্ব, একই সঙ্গে সারবান অথচ নির্ভার, দৃঢ় আর নিরঙ্কুশ তাঁর রচনা।

পুরোপুরি সাহিত্য নিয়ে তাঁর যত লেখা, তাঁর অন্তত দুটো রকম আছে। একদিকে বিভিন্ন লেখকদের সম্পর্কে তাঁর অনুভব, অন্যদিকে সাধারণভাবে লেখালেখির নানা প্রসঙ্গে আলোচনা।

আর এইসব আলোচনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ছাপা হয়েছিল ‘কবিতা’ পত্রিকায়, বিত্তে ও দাপটে তার সঙ্গে তুলনীয় ছোটো পত্রিকা বাংলায় আর একটাও হয়নি।

লেখক - কবিদের সম্পর্ক, তাঁর আগের সবসময়ের এবং পরের প্রজন্মের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের কৃতি নিয়ে বুদ্ধদেব অক্লান্ত ও উদ্যমী আলোচনার যে খরানা তৈরি করেছিলেন ‘কবিতা’ পত্রিকায়, তাঁর পরে সেই উদ্যোগের কোনো সমান্তরাল আর তৈরি হল না। সমসাময়িক আর অনুজদের প্রসঙ্গে স্বাধিকার নিয়ে কথা বলবার লোক এখন কোথায়?

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য বিষয়ে রচনা সম্পর্কে জ্যোতির্ময় দত্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন একটি সাম্প্রতিক লেখায় : ‘সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসু-র স্বাতন্ত্র্য এই যে তাঁর কোনও ইডিওলজি কি থিয়োরি নেই; আলোচ্য রচনা তাঁর কাছে একটি নতুন আবিষ্কার। তাঁর সুবিস্তৃত সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা আলোচ্য সৃষ্টির মুখোমুখি হয়। ...তিনি কোনও শিবিরের নন। সাহিত্যের কোনও একটিমাত্র মানদণ্ড নেই তাঁর নতুন - নতুন অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রবেশ্য এর চিত্ত। এবং এইজন্যই তিনি এতো বিভিন্ন চরিত্রের লেখককে আবিষ্কার করতে পেরেছেন, স্বাগত জানাতে পেরেছেন, তাদের প্রচার হয়েছেন।’

একদিক থেকে কথাটি খুবই খাঁটি। সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুকুমার রায় এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে রিলকে থেকে হান্স অ্যান্ডারসন বা জেরো..৬ এমন দিকচিহ্নহীন মনোযোগের নজির থেকে একথা বলাই যায় যে বুদ্ধদেব কোনো পূর্বচিহ্নিত তাগিদ থেকে সাহিত্য বিচারে আগ্রহী হতেন না। তাঁর ভালোলাগার যে পদ্ধতি, যে কোনো স্বাভাবিক পাঠকের মতোই তা আকস্মিক অথবা স্বাধীন।

অন্যদিক থেকে, কেউ কেউ বলতে পারেন হয়ত যে, বুদ্ধদেবেরও একটা নিজস্ব নির্ণয় ছিল। জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে তাঁর বিলম্বিত অতৃপ্তি থেকেই বোঝা যায় যে তাঁরও একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিগত রুচি ছিল, যা তিনি নির্মমভাবে লালন করেছেন শেষ পর্যন্ত, ‘করিডরের দুপাশের সার সার মানসিক প্রকোষ্ঠ’ যাকে বলেছেন, জ্যোতির্ময়, বুদ্ধদেব নিজেও সেই প্রকরণের অবধারিতভাবে অন্তর্গত ছিলেন, থাকাই স্বাভাবিক, যে কোনো সচেতন, শিক্ষিত, স্বমহিম মানুষই নিজের রচিত একটি অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালোবাসেন, তাতে তাঁদের দেখা ও বোঝার তাৎপর্যের কোনো হানি ঘটে না। অন্তত, বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে ঘটেনি। তরুণতর কবিদের লেখা ‘বুঝতে পারছেন না’ বলে ‘কবিতা’ বন্ধ করে দেবার অভিপ্রায়ে তাঁর রচিত সততাই প্রমাণিত। মায়াকোভস্কির বা পাস্তেরনাক সম্পর্কে প্রাথমিক উৎসাহ সঞ্চার যেভাবে হয়েছিল তাঁর তা-ই প্রমাণ করবে, সাহিত্যপাঠে কতটা উদার ও নিঃসঙ্কোচ ছিলেন তিনি।

মায়াকোভস্কির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের প্রতিক্রিয়া তিনি এভাবে : ‘কবিতা পড়ে, জীবনী পড়ে, মানুষটাকে মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে আমার, থেকে - থেকে মনে পড়ছে, ভুলতে পারছি না। অনেকখানি ভান আছে না কবিতায়? দেখানোপনা? অভিনয়? যে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ডায়েরি লিখে চলেছে, অথচ এমন অহমিকা যে ভাবছে তার জীবন সংক্রান্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটিও কবিত্বময়, আর সাহিত্য : নেই বিলকের প্রচ্ছন্নতা বা পাস্তেরনাক - এর তির্যক ভঙ্গি, সবই চড়া গলার চ্যাঁচামেচি— ফেনিয়ে ওঠা, উপচে পড়া, ছেলেমানুষি করুণ!... আশ্চর্য, এই অত হট্টগোলের মধ্যেও বোঝা যায় লোকটা খাঁটি কবি ... বলো তো কী জাদু আছে কবিতায়? বুক দুরদুর করে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, আর নিজেকে মনে হয় ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ। এই মায়াকভস্কিরও লেখা পড়তে হবে।’

প্রথমেই বুঝতে হবে শেষের কথাটি। একধরনের মুগ্ধ বাধ্যতা আছে এই উচ্চারণে। যে লেখায় জাদু আছে, একবার যখন টের পেয়েছেন তখন সে এলাকা না পড়ে ভুলে যাবার মানুষ তো বুদ্ধদেব নন। শুধু তাই নয়, প্রসঙ্গত নিজের লেখালেখি সম্পর্কে তাঁর যে আবেগার্ত আক্ষেপ, তাও নজর করার মতো এমনই ছিলেন বুদ্ধদেব, লেখার বিষয়ে কোনো উচ্চারণেই কপটতা জানতেন না তিনি। এ প্রসঙ্গে পরে আর একটু আলোচনা করা যাবে।

পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর প্রাথমিক চঞ্চলতা ছিল এইরকম: ‘...এগুলো এক ‘সরল’ পাঠকের অভিজ্ঞতার বিবরণ। পাস্তেরনাক এর জীবনী বিষয়ে অল্পই জানি আমি। তাঁর পূর্ব রচনাও বেশি পড়িনি। প্রথম যখন বোদলেয়ার বা রিলকে পড়েছিলাম তাদের বিষয়েও অজ্ঞ ছিলুম। কিন্তু কবিতাগুলো যেন কাগজ থেকে লাফিয়ে উঠে মুখের উপর মারল আমাকে। এবারেও তা-ই হলো।’

তার আগে, ‘ডক্টর জিভাগো’ হাতে পাবার অব্যবহিত পরের মুহূর্তগুলির বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি এভাবে : ‘চলে আসছি; এমন সময় দোকানি বললেন, ‘ডক্টর জিভাগো’ এসেছে, নেবেন একখানা? আর তখন আমার মনে পড়লো যে এই বইখানার জন্য আজ বেরিয়েছিলুম। বাড়ি এসে প্রথমেই কবিতাগুলো পড়লাম, তিনটি বা চারটি, অন্যগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করলাম, তারপর আর পড়লাম না। যথেষ্ট ; একবারের মতো এই যথেষ্ট, এ কটিই যথেষ্ট। একসঙ্গে বেশি নেয়া যায় না, মনের উপর কবিতা যে কাজ করবে তার জন্য সময় দিতে হবে।

সুতরাং বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যপাঠ প্রসঙ্গে প্রথমে যে দুটি শব্দ লিখেছিলাম, আকস্মিক আর স্বাধীন, মায়াকভস্কি আর পাস্তেরনাক বিচারে তা-ই প্রাসঙ্গিক ছিল, বোঝাই যাচ্ছে। প্রসঙ্গত জানা গেল, বোদলেয়ার বা রিলকে সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের সঞ্চারও হয়েছিল এরকম আকস্মিক স্বাধীনতার সঙ্গেই। সেইজন্যই; কোনো লেখক সম্পর্কেই অবিচল উৎকণ্ঠা থাকত না তাঁর। সুকান্তর প্রয়াণের পরে যে নিদারুণ একটি লেখা লিখেছিলেন তিনি ‘কবিতা’ পত্রিকায়, তাতে সুকান্ত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আর ব্যাকুল অভিযোগ সমান আর্তির সঙ্গে

জানিয়েছেন। 'পদাতিক' - এর পরে সুভাষ যে 'কাব্যের ক্ষেত্রে আর কিছু করলেন না' বললেন তিনি, তা থেকে বোঝা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণতাভরা দ্রুতচলটি মনে ধরেছিল তাঁর বিষয়ের দাপট তিনি টের পেতেই চাননি। ভাষার ভাঁজে ভাঁজে যে গোপন উচাটন, তার এতটুকুও এড়াতো না বুদ্ধদেবের বিবেচনায়, তাঁকে মজিয়ে রাখত তা। সুকান্ত সম্পর্কে তাই তিনি বলেন ঃ 'ভালো লাইন সে মাঝেমাঝেই লিখেছে; ছন্দে ভুল নেই, হাতের লেখা সুন্দর যা বলতে চায় স্পষ্ট করেই বলে...।' বুদ্ধদেবের কাছে 'ভালো' লেখার তাৎপর্য কী ছিলো, তা পরের কথাগুলিতে বলেই দেওয়া আছে। ছন্দচেতনা বা বলার স্বচ্ছতার সঙ্গে হাতের লেখার সৌন্দর্যের মতো নির্বিরোধ একটি ঘটনাও তাঁর কাছে জরুরি, কিন্তু একবারও বলা নেই বিষয়ের 'মানবিকতা', 'দায়বদ্ধতা', 'মহত্বের' মতো কোনো প্রসঙ্গ। বরং, বিষয়ের দিকে যখন চোখ ফেরান, তখন তাঁর উচ্চারণ নিঃসংশয়ে এইরকম : 'রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছো তুমি ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়।' লক্ষ্য করার শব্দ 'পদ্য'। আসলে, রাজনীতি যে লেখার ১৪৪ প্রসঙ্গ, তা তাঁর বিচারে কবিতা নয়, 'পদ্য'। 'কবিতা' প্রকাশের একটা পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতার মতো রমরমা চারপাশে থাকলেও, কবিতা ও তার কাণ্ডারী বুদ্ধদেব কিন্তু এগিয়েছেন তাঁর সরু, একলা, নির্মম পথ ধরে, আকাশের 'বাঁকা জল' খেলা নয়, গ্রাস করতে আসছে, কিন্তু বুদ্ধদেব নির্বিকার; 'সভ্যতাও ফ্যাসিজম' আর 'সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প সংস্কৃতি' নামে চটি দুটি বই বেরিয়েছিল এই সময় কিন্তু 'কবিতা'কে 'স্বধর্মভ্রষ্ট' হতে দেননি, এমনকী তাঁর নিজের সাজানো গ্রন্থপঞ্জিতে এ দুটি পুস্তিকার উল্লেখই করেননি। অথচ, কত সজাগ, মনস্ক আর সক্রিয় ছিলেন তিনি। পল ভার্লেন থেকে দীনেশরঞ্জন দাশ, এমনকী অজয় ভট্টাচার্য - হিমাংশু দত্তর মৃত্যুও 'কবিতা' সম্পাদককে আর্ত করত। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে 'কবিতা'য় ছাপা গদ্যটি বুদ্ধদেবের স্বাধীন বিবেচনাবোধের উদাহরণ হিসেবে একেবারে ওপরের দিকে থাকবে। 'স্বাভাবিক শক্তিতে ' অসামান্য' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবশ্য এখানেও বলে রাখেন তিনি : 'এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে কম 'পাকা লেখা', সবচেয়ে কম স্পষ্ট, কিন্তু সেইজন্যেই তাতে বারবার দিগন্ত দেখা যায়, যেন আশ্চর্যেরও আভাস দেয় থেকে থেকে।' অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্টতার প্রতি সমর্থন বুদ্ধদেবের বরাবরই ছিল, প্রায় একই কথা বলেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রসঙ্গে তাঁর 'কবিতা রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে : 'রবীন্দ্রনাথের সে সব কবিতা আমাদের পক্ষে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, যেগুলি সবচেয়ে কম স্পষ্ট ও নিশ্চিত। তাঁর প্রতিভার এই বিশেষ চরিত্র লক্ষণটি বেরিয়ে আসে তাঁর ব্রহ্ম সঙ্গীতের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র তুলনা করলে। 'পদপ্রান্তে রাখ সেবকে,/ শান্তিসদন সাধনধন দেবদেহ হে' : যদি 'গীতবিতান'এ মুদ্রিত না থাকতো তাহলে এই ঈশ্বরবিশ্বাসী উল্টো মনোভাবসম্পন্ন গানটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে বিশ্বাস করা সহজ হতো না : উপরন্তু, এক 'দুখতাপ বিঘ্নতরণ শোকশান্তস্নিগ্ধচরণ' ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকেও গ্রহণ করতে আমাদের কারো কারো আপত্তি হতে পারে।

কিন্তু 'আলোয় আলোকময় করে হে/ এলে আলোর আলো' ... এই কবিতাটিতে 'আলো' বলতে কী বোঝাচ্ছে তা অস্পষ্ট বলেই অনাস্থার অপনোদন ঘটে, আমরা তৎক্ষণাৎ অতি সহজে কবির কাছে আত্মসমর্পণ করি।' এই অনির্দেশ্য রহস্যময়তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরবতী' লেখায় না পেয়েও তাঁর 'বস্তুনিষ্ঠা'র তারিফ করেছেন বুদ্ধদেব, মানিক 'বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা' এইখানে যে 'বর্তমান' প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজছেন, বলেছেন এমন নির্মোহ কথাও।

সাহিত্য - বিবেচনায় এমন দৃকপাতহীন দার্ঢ্য বুদ্ধদেবকেই মানাতো। সাহিত্যে বা ব্যবহারে কোনো অশোভন উদ্যোগকে কোনোদিন প্রশ্রয় দেননি তিনি। মনে পড়ে 'কবিতা'র একটি 'সাময়িক সাহিত্যিকের পক্ষে তার চাইতে অপমানজনক কোনো দলিল আমাদের চোখে পড়েনি", বলেছিলেন বুদ্ধদেব, কারণ ''লেখকদের এর জন্য 'প্রার্থী' হতে হবে: পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চাকুরির আবেদনপত্রের মতো জীবনপঞ্জী লিখে দিতে হবে (জন্মের তারিখ, বিদ্যালয়দিও নাম শুদ্ধ) শুদ্ধ তা-ই নয়, দু-জন সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিকের সুপারিশ পত্র সবই না থাকলে সেই আবেদন বিবেচিত হবে না। বারো কপি পুস্তকও প্রেরিতব্য।' বুদ্ধদেবের আক্ষেপ: 'এই রকম চিত্রবহুল যে প্রকাশিত হতে পারলো, আর তা নিয়ে কোনো আন্দোলনও হলো না, এতেই বোঝা যায় আমরা এখনো সভ্যজগতের বহুদূরবর্তী কোন মরুভূমিতে বাস করছি।' এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের শেষ কথাটি ক্রমশ কী নির্মমভাবে সত্যি হয়ে উঠেছে : 'এই বুভুক্ষাময় দেশে সাহিত্যিকের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ দুষ্প্রাপ্য।'

এই দুম'ল্য আত্মসম্মানবোধেই তিনি সরব হয়েছিলেন বাংলা সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে 'আঞ্চলিক' বানিয়ে হিন্দির আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আকাশবাণীর 'অসংগত ও অন্যায়' দাবির প্রতিবাদে। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী তাঁদের কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারিত 'বক্তৃতাগুলো রেকর্ড করে রাখবেন তাঁরা, যতবার ইচ্ছে সম্প্রচার করবেন — অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদেও সম্প্রচারের অধিকার তাঁদের থাকবে, কিন্তু আমি, লেখক, রচনাটির স্রষ্টা, ইহ জীবনে তা থেকে আর এক নয়া পয়সাও উপার্জন করবো না'— বড়ো প্রতারক মনে হয়েছিল এই পদ্ধতি, বুদ্ধদেবের কাছে। এক্ষেত্রেও বুদ্ধদেবের ভরসা ছিল আত্মসম্মান সম্পন্ন' লেখকদের ওপরেই, তাঁর মনে হয়েছিল, 'প্রত্যেক লেখকের আর্থিক ও ব্যক্তিস্বার্থ এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত; সাহিত্যিকবৃত্তের মৌলিক মর্যাদা জড়িত এর সঙ্গে।'

আসলে, বুদ্ধদেব বসুর কাছে 'লেখক' এর আদর্শ আদল ছিল, যত্নে ও নির্বাচনে, ভাবনার ও সাধনায় অক্ষুন্ন একটি চরিত্র বুঝতেন তিনি, 'লেখক' বা সাহিত্যিক হিসেবে। 'লেখার ইস্কুল' এরও যে একটি অসম্ভব পরিকল্পনা ভাবতে পেরেছিলেন তিনি, তা এই বোধ থেকেই। তিনি জানতেন, শেখানো যায় না তাও। কিন্তু প্রসঙ্গটি যে তাঁকে ভাবিয়েছিল তার কারণ, চারপাশে 'ঝুড়ি - ঝুড়ি অপটু, অক্ষম ও অপাঠ্য লেখা'র নির্বিকার বহর। সাহিত্যিক হবার নেশায় উন্মত্ত লোকজন এখনও যেমন আছেন, বুদ্ধদেবে বিশ্বাস করতেন, লেখাটাই যাদের প্রধান কা, এমনকী জীবিকা, তিনি সৎ ও পরিশ্রমী হন, তাঁর লেখা ভালো হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, ঠিক বিপরীত কান্ডই প্রায় ঘটতে দেখছি আমরা বাংলায়, পরিশ্রমের ব্যাপারটাই শুধু যা মিলে যায়। তবে বুদ্ধদেব লেখকের সততায় বিশ্বাস করতেন বলেই, এমনটা বলতে পেরেছিলেন।

বেঙ্গল কেমিক্যালের 'সাহিত্যিক - কর্মসচিব' রাজশেখর বসু যে, 'সাহিত্যের পথে বহুদূরে পৌঁছেছিলেন, তার কারণ তাঁর সাধু, বিনীত ও পরিশ্রমী স্বভাব', বলেছিলেন বুদ্ধদেব। প্রথম চৌধুরীকে তার মনে হয়েছিল পৃথিবীর সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন, 'যারা অন্ধকারে সভ্যতার দীপ জ্বালিয়ে রাখেন', যাঁর একমাত্র পক্ষপাত ছিল 'মৌল মনুষ্যত্বের প্রতি।'

এই পক্ষপাত বুদ্ধদেব বসুও আজীবন লালন করে গেছেন। আত্মমর্যাদার এই মৌলিক ধরনটি তাঁর যাবতীয় উদ্যম ও উদ্যোগের সূত্র হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের মূলেও তো ছিল কবিতাকে 'সসম্মানে' 'সুনির্বাচিত' পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি 'ইচ্ছে'। তিনি নিজেই 'সসম্মানে' আর 'সুনির্বচিত' কথাদুটিকে 'লক্ষ' করতে বলেছিলেন। এই সচেতন ইচ্ছের অধিকারেই সজাগ, সচেতন ও উদ্যমী সম্পাদনার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বুদ্ধদেব বসু।